# বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও আইএমএফ'র চাপে কৃষিতে ভর্তুকি হ্রাস খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অশনিসংকেত

## জাতীয়-বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষির জন্য মোট বাজেটের ২০% বরাদ্দ চাই

### ১. দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে জাতীয় বাজেটে কৃষি উন্নয়নকে বিশেষ গুরত্ব দিতে হবে:

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির নানা সূচকে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় অর্জন রয়েছে। এর পরেও এখনও প্রায় দেশের ৩০ ভাগেরও বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শতকরা ৪১ ভাগ শিশু অপুষ্টিতে, ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী একত তৃতীয়াংশ শিশু রক্তশূণ্যতায় এবং স্কুলগামী শিশুদের ৪০ ভাগই আয়রন ঘাটতিতে ভোগে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রায় ৩৬%-এর ওজন বয়সের তুলনায় কম। দারিদ্র ও অপুষ্টির এই চিত্র বদলে দেওয়া যায় কৃষির মাধ্যমে। দেশের প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ এই কৃষির উপর নির্ভর করে, মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৪৫ ভাগ নিয়োজিত এই খাতে। সুতরাং এই খাতের পর্যাপ্ত বিনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত কারণেই কাঙ্ক্ষিত।

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এটা স্পষ্ট যে, ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ এসে হাজির হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, ভর্তুকি হ্রাসে আন্তর্জাতিক নানামুখী চাপ, নানা কারণে অকৃষি খাতে কৃষি জমির ব্যবহার বাড়ায় প্রতি বছর ১% হারে কৃষি জমি হ্রাস, দ্রুত নগরায়ন ইত্যাদি নানা কারণে খাদ্য নিরাপত্তা ভীষণ হুমকির মুখে পড়বে। এই হুমকি মোকাবেলায় খাদ্য উৎপাদনে বা কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া ছাড়া বিকল্প থাকবে না। শিল্প, সেবা খাত বা অন্যান্য খাতে জাতীয় আয় বাড়লেও খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি সফলভাবে মোকাবেলার নিশ্চয়তা দেয় না। আমাদের মনে আছে ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের সরবরাহ কমে যাওয়া এবং মুল্য বেড়ে যাওয়ার সময় বাংলাদেশ অর্থ দিয়েও চাল কিনতে পারেনি। জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টি বিবেচনা করে কৃষির জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে।

### ২. কৃষির প্রবৃদ্ধি কমছে! জাতীয় বাজেটে আনুপাতিক হারে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে!

বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার এ বছর ৭% ছেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যেও বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সন্তোষজনক বলেই মনে করা হয়। কিন্তু কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত এই প্রবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কৃষির প্রবৃদ্ধির হার বরং নিয়মিতভাবেই নিম্নমুখী:

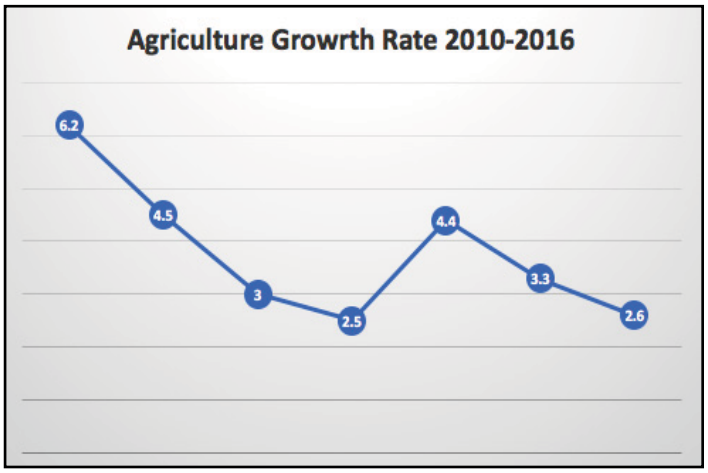


*জিডিপিতে কৃষির অবদান কমছে: কমছে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণও :* অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান কমে যাওয়া হয়ত দোষের কিছু নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি কৃষি প্রধান দেশে, এখনও যে খাতটিতে মোট শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক অংশ জড়িত, ক্রমর্বধমান হারে জিডিপিতে তার অবদান কমে যাওয়া দুশ্চিন্তার বিষয় বৈকি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মোট জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল (শুধু শস্য এবং শাক সবজি) ১০.৮৮%, সেটা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৮.৩২%। অন্যদিকে নানা কারণে কৃষিতে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ কমছে। ২০১০ সালের লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৩০% কৃষিতে নিয়োজিত ছিল, ২০১৩ সালে সেটা হয় ৪৫.১০%।

এই তথ্য কৃষিতে মানুষের অংশগ্রহণে অনাগ্রহ তৈরির একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রকাশ করে। কৃষি প্রধান একটি রাষ্ট্রের জাতীয় বাজেটে এই বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে।

২০১০ থেকে ২০১৬ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মাঝখানে ২০১৪ সাল ছাড়া প্রায় প্রতি বছরই কৃষির প্রবৃদ্ধির হার কমছে। ২০১০ সালে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫%, ২০১৬ সালে এসে সেটা দাঁড়িয়েছে ২.৬%।

খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চিত করতে এই খাতে তাই প্রয়োজন যথাযথ জাতীয় মনযোগ, প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ। প্রতি বছরই আমাদের জাতীয় বাজেটের আকার বাড়ছে, মোট আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিক হারে কৃষির জন্যও বরাদ্দ বাড়বে সেটাই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। আমরা লক্ষ্য করেছি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয় ১৩,৬৭৫ কোটি টাকা, যা টাকার অঙ্কে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৫৩৬ কোটি টাকা বেশি। ২০১৬-১৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তুলনায় বাড়ে প্রায় ২৯%, অথচ কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হযয় মাত্র ১৮.৫৪%। এর আগের অর্থবছরে কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৪.২১%, অথচ বর্তমান অর্থ বছরের জন্য এখাতে বরাদ্দ মাত্র ৪.০১%। মোট বাজেটের আকার বাড়লেও কৃষির জন্য বরাদ্দ কমে গেছে ০.১৯%।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে টাকার অংকে বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা বাড়লেও, মোট বরাদ্দের আনুপাতিক হার কমে গেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বরাদ্দের ১.৭% বরাদ্দ আছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য, গত অর্থ বছরেও এই বরাদ্দ ছিল ২%। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৩.১০% বরাদ্দ ছিল কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য। সেটা কমতে কমতে এখন ১.৯%-এ দাঁড়িয়েছে।

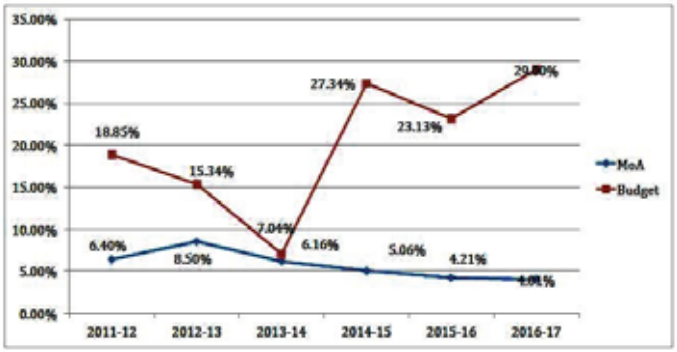


ভারতের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ঘোষিত ইউনিয়ন বাজেট বা জাতীয় বাজেট বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। দেশটিতে **২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নর জন্য বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রায় ২৫%!** কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা বাড়ানো হয়েছে ১ ট্রিলিয়ন রুপি, শস্য বীমার জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে প্রায় ৪০০০ কোটি রুপি। এই অর্থ বছরে দেশটির ৪০% শস্য এলাকা এবং এর পরের বছর ৫০% এলাকাকে শস্য বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিবেশী এই দেশটির কৃষির জন্য এ ধরনের বরাদ্দ বা উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বাংলাদেশেও জাতীয় বাজেটে এই ধরনের উদ্যোগ আমরা আশা করি।

## ৩. দুর্যোগে পীড়িত কৃষককে বাঁচাতে, আপদকালীন সময় সহায়তার জন্য কৃষিতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে:

সাম্প্রতিক অকাল বন্যায় হাওর এলাকার কৃষির যে ক্ষতি হয়েছে, সরকারের কোনও সহযেগিতা ছাড়া কোনভাবেই স্থানীয় কৃষকদের একার পক্ষে তার ক্ষত কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয়। এই বন্যা আমাদেরকে এই বার্তাই দেয় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই দেশে আপদকালীন সময়ে কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশেষ সরকারি বরাদ্দ সবসময়ই থাকতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য বীজসহ বিভিন্ন খাতে আর্থিক সহায়তা ও ভর্তুকি সহায়তা দিতে হবে।

কৃষক এবং কৃষি নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের পক্ষ থেকে সব সময়ই কৃষিতে ভর্তুকি বাড়ানোর দাবি করা হয়। কিন্তু প্রকৃত হিসাবে কৃষির জন্য ভর্তুকি আসলে কমানো হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃষিতে ৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হলেও সংশোধিত বাজেটে তা ৭০০০ কোটি করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দ প্রকৃত পক্ষে আরও কমিয়ে ফেলা হলো। বাজেটের আকার এবং টাকার অঙ্কে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়লেও, ভর্তুকি রাখা হয় সেই ৯০০০ কোটি টাকাই, সংশোধিত বাজটে যা ৬০০০ কোটি টাকা করা হচ্ছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম কমে যাওয়ায় কৃষির ভর্তুকি কমানোর যুক্তি দেখানো হলেও, প্রকৃত পক্ষে এই ভর্তুকিকে বিনিয়োগ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। কারণ, কৃষককে ১ টাকা ভুর্তুকি দিলে কৃষক ১৫ টাকা ফেরত দিতে পারেন। দেশের অনেক খাত আছে যেখানে ভর্তুকি দিলে তার বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। ব্যাংকগুলোর ব্যর্থতায় বা অব্যবস্থাপনার কারণে সরকারকে ব্যাপক পরিমাণ অর্থ যোগান দিতে হচ্ছে, নানাভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ, দেশের এক বছরের লুটপাট বা পাচারকৃত অর্থ দিয়ে অনেক বছরের কৃষি ভর্তুকি মেটানো সম্ভব।

## ৪. ফাঁদ পাতছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা: তাদের পরামর্শে কৃষিতে ভর্তুকি কমানো হবে আত্মঘাতি

কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১০ম মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় কৃষিতে ভর্তুকির অবসানের ব্যাপারে সদস্য হিসেবে বাংলাদেশও একমত পোষণ করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধনী দেশগুলো ২০২৩ সালের মধ্যে কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করবে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সময়সীমা ২০৩০ সাল পর্যন্ত। অনেকেই বলে থাকেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এই চুক্তিতে শুধুমাত্র কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে, সকল ক্ষেত্রে নয়। এই বিষয়টির বিপদজনক দিক হলো, যদি অন্য কোন দেশ বাংলাদেশ বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, সার-ডিজেলে ভর্তুকি দেওয়ায় সেটা কৃষি পণ্য রপ্তানিকে প্রভাবিত করছে, তাই এই ভর্তুকি বন্ধ করতে হবে। এরকমটা হলে সেটা বাংলাদেশে জন্য বেশ

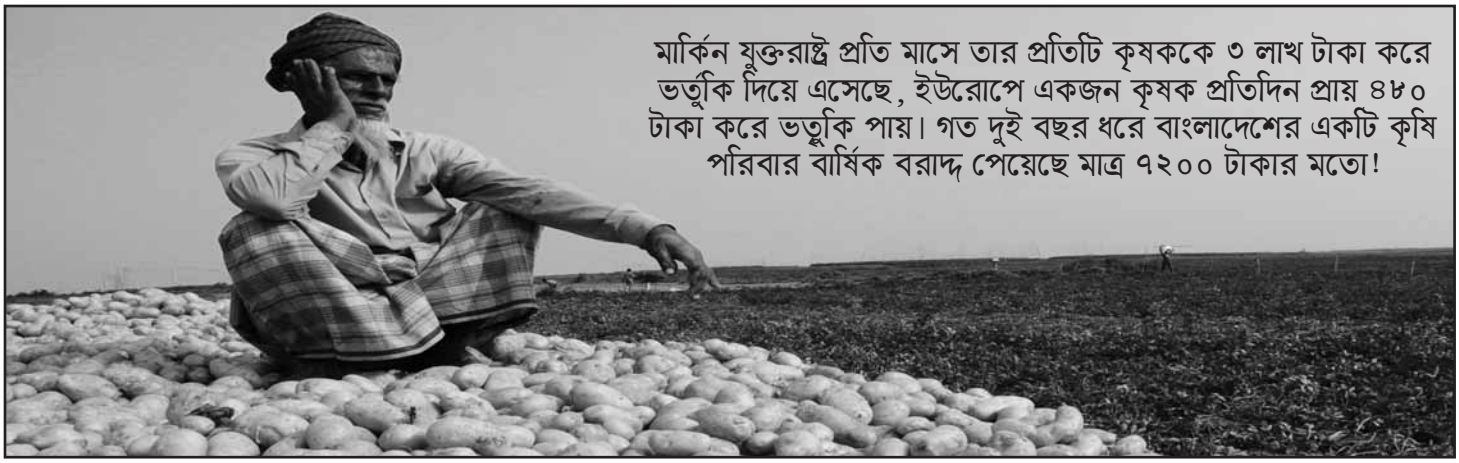

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে তার প্রতিটি কৃষককে ৩ লাখ টাকা করে ভর্তুকি দিয়ে এসেছে, ইউরোপে একজন কৃষক প্রতিদিন প্রায় ৪৮০ টাকা করে ভর্তুকি পায়। গত দুই বছর ধরে বাংলাদেশের একটি কৃষি পরিবার বার্ষিক বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ৭২০০ টাকার মতো!

বিপদই হয়ে যাবে। সুতরাং এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষিতে ভর্তুকি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়ার চাপ আসতেই পারে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নাইরোবি চুক্তি বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে ধনী দেশগুলোর চরম এক চালাকি। হংকং ঘোষণা (২০০৫ সাল) অনুযায়ী উন্নত দেশগুলো কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের মধ্যেই সকল ভর্তুকি বাতিলের অঙ্গিকার করে, নাইরোবিতে এসে তারা সেই সুযোগটাকে আরও ১০ বছর বাড়িয়ে ২০২৩ সাল পর্যন্ত করে নিল। আবার এই নিয়ম প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং দুগ্ধ শিল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তার মানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের এই কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পে ভর্তুকি অব্যাহত রাখার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশ কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে এখনও অনেক পিছিয়ে, তাই এই ধরনের সুযোগ আমরা পাচ্ছি না, অথচ কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি কমিয়ে দিতে হচ্ছে।

আগামী বাজেটে এই আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষির ভর্তুকি কমানোর মতো আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

### ৫. ভর্তুকি বন্ধ হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষুদ্র কৃষক, ঝুঁকিতে পড়বে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা:

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে উন্নত দেশের কৃষি এবং বাংলাদেশের কৃষির বাস্তবতা এক নয়। উন্নত দেশগুলো ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন কৃষিতে বিরাট আকারের কৃষি ভর্তুকি দিয়ে তাদের কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন ঘটিয়েছে, কৃষকের সক্ষমতা বেড়েছে, তাদের বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষকরা প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে এই অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই উন্নত একটি দেশে ভর্তুকি বন্ধ করা আর বাংলাদেশে ভর্তুকি বন্ধ করা এক নয়।

বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং ধনী দেশগুলোর চাপে বাংলাদেশ কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করছে। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি ও সহায়তা দিয়ে যখন তারা শিল্পোন্নত হয়েছে, তখনই ভর্তুকি কমানোর দাবি তুলছে। কারণ তারা ভর্তুকি ও সহায়তা দিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলেছে। এখন তাদের প্রয়োজন সেই শিল্পের বাজার। তারা কোন-ভাবেই চায় না স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাক, এতে করে তাদের বাজার বন্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল এবং এখনো কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত-করণের ব্যাপক প্রযুক্তি ও সফলতা নেই, সেহেতু কৃষি কাঁচামালই আমাদের বিক্রি করতে হবে। উন্নত দেশগুলো তাই চায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে তার প্রতিটি কৃষককে ৩ লাখ টাকা করে ভর্তুকি দিয়ে এসেছে, দেশটি প্রতিদিন কৃষিতে প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়। ইউরোপে প্রতিদিন একজন কৃষক প্রায় ৪৮০ টাকা করে ভর্তুকি পায়। ২০১০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রায় ৬ লাখ কোটি টাকা কৃষি উন্নয়নে ব্যয় করে, এর মধ্যে প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকাই ছিল সরাসরি কৃষি ভর্তুকি। অন্য দিকে গত দুই বছর ধরে বাংলাদেশের একটি কৃষি পরিবার বার্ষিক বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ৭২০০ টাকার মতো!

বাংলাদেশের কৃষকরা সাধারণত সার ও ডিজেলের ক্ষেত্রে নগদ ভর্তুকি সহায়তা পেয়ে থাকেন। ২০৩০ সালের পর বন্ধ করতে হবে কৃষি পণ্যে রপ্তানিতে সহায়ক সকল সরকারি সহযোগিতা। সার ও ডিজেলে ভর্তুকি বন্ধ করলে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে, ফলে বাজারে আমাদের কৃষি পণ্যের মূল্য বাড়বে। আবার ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষক বাজারেও তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে না। অন্য দিকে যেহেতু ২০৩০ সালের পর কৃষিপণ্যকে সুরক্ষা দিতে সরকার কিছু করতে পারবে না, তাই উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে কম দামের কৃষি পণ্য আমাদের দেশে ঢুকবে, ফলে আমরা বাধ্য হয়ে সেগুলো কিনব। সরকারকে তাই এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে বাজেটে কৃষির জন্য বরাদ্দ দিতে হবে

### ৬. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রয়োজন:

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে কৃষিকে বাঁচাতে কী উদ্যোগ নেওয়া হবে তার সুনির্দিষ্ট কৌশল থাকা উচিৎ জাতীয় বাজেটে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘন ঘন ঝড়, লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, আকস্মিক বন্যা এবং এর ফলে জলবাদ্ধতা, প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের স্বাভাবিক চাষাবাদ ব্যহত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। কৃষককে এই পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলতে হবে। এই জন্য কৃষককে প্রশিক্ষণ, উপকরণগত সহায়তার জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকতে হবে বাজেটে।

### ৭. কৃষক বাঁচাতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক:

দেশের প্রায় ৫০ জেলার ১৫০টি উপজেলার মানুষ নদী ভাঙ্গনের শিকার হয় প্রতি বছর। প্রায় ১০ লাখ মানুষ প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনের ফলে বসতবাড়ি, কৃষি জমি ইত্যাদি হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়। নদী ভাঙ্গনের করাল গ্রাসে প্রতিবছর এই মানুষগুলোর একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় যোগ দিচ্ছে। বাজেটে উপকূলের বাঁধ সংস্কার, নতুন বাঁধ নির্মাণসহ এ খাতে বিশেষ বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু প্রচুর কৃষি জমি ও গবাদি পশু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপকূলের কৃষক ও জেলে। এ অবস্থার অবসানে উপকূলীয় এলাকায় টেকসই বাঁধ নির্মাণের কোনও বিকল্প নেই। আগামী অর্থ বছরে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ বা এ সংক্রান্ত সমস্যা সামাধানে পর্যাপ্ত বরাদ্দ চাই।

### ৮. চাই বীজ সার্বভৌমত্ব: গুরুত্ব দিতে হবে উন্নত মানের দেশীয় বীজের উপর:

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম শর্ত হলো বীজের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব অর্জন। উচ্চ ফলনের নামে আমাদের কৃষিতে বেশ কিছু বিতর্কিত প্রযুক্তি ঢুকে পড়েছে। উন্নত মানের বীজ বলতে যদি বোঝানো হয় উন্নত মানের দেশীয় বীজ, অথবা সরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত বিদেশি বীজ, তাহলে সেটা কৃষির জন্য ভাল। বিএডিসিকে এ দায়িত্ব দিতে হবে। উন্নত মানের বীজ সরবরাহের নামে এ খাতটি বেসরকারি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়া আত্মঘাতী। কারণ, তা শুধু বীজের মূল্যই বাড়াবে না, দেশের পুরো কৃষি ব্যবস্থাকে জিম্মি করে ঐ কোম্পানিগুলোকে মুনাফা লুটে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে। বীজ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় বীজের উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে বিএডিসি'র মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

### ৯. কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ন্যায্যমূল্য কমিশন গঠন অত্যাবশ্যক:

গত কয়েক বছর কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্যের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। ন্যায্যমূল্য না পেয়ে কৃষক তার পণ্য রাস্তায় ঢেলে দিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত বছর একমণ ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ হয়েছে প্রায় ৬০০-৮০০ টাকা, সেখানে কৃষক এর জন্য দাম পেয়েছেন ৩০০-৫০০ টাকা। ফলে ধান উৎপাদনে অন্তত কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ধান আমাদের প্রধান খাদ্য শস্য, এটি উৎপাদনে কৃষক হতাশ হয়ে গেলে এটি আমাদের পুরো খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে হুমকির মধ্যে ফেলে দেবে।

গত বছর কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার নিয়ম চালু হলেও অনেক জায়গায় কৃষক তার সুফল পাননি বলেই পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। আমরা মনে করি, কৃষক বাঁচাতে এবং কৃষি প্যণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে "জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন" গঠন করতে হবে। এই মূল্য কমিশন কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে কাজ করবে এবং সরকারি ও বেসরকারি কৃষি পণ্য ক্রয়পদ্ধতিতে সংস্কার আনবে।

### ১০. আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবিসমূহ:

১. বাজেটের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে

২. বাজেটে কৃষির জন্য ভর্তুকি বাড়াতে হবে, ভুর্তুকির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

৩. কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে মূল্য কমিশন গঠন করতে হবে

৪. ক্ষতিকর বিদেশি বীজ আমদানি বন্ধ, বিটি বেগুন, গোল্ডেন রাইসসহ বিতর্কিত জিএমও কৃষি প্রবর্তন বন্ধ করতে হবে। বীজ সার্বভৌমত্ব অর্জনে বিএডিসিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে

৫. পাটের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে আমরা সাধুবাদ জানাই। পাটের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে

৬. কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

৭. কৃষক বাঁচাতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ:

উপকূলীয় কৃষক সংস্থা, বাংলাদেশ মৎস্য শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদশে কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় নারী কৃষক সংস্থা, বাংলাদেশ কিষাণী সভা, বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতি, লেবার রিসোর্স সেন্টার, নলছিড়া পানি উন্নয়ন সমিতি, দিঘন সিআইজি, কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী,

**যোগাযোগ:**

**১. মোস্তফা কামাল আকন্দ**, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.net,

**২. মো. মজিবুল হক মনির**, মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, ইমেইল: munir@coastbd.net

সচিবালয়: কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭।
ই-মেইল: info@coastbd.net, ওয়েব: www.coastbd.net